৯

অর্থের চাহিদা
Demand for Money

আদিকালে অর্থ শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতো, বর্তমানে বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও মূল্যের পরিমাপক, মূল্যের সংরক্ষক ও স্থগিত লেনদেনের পরিমাপক হিসাবে অর্থের ব্যবহার হচ্ছে। অর্থ ছাড়া বর্তমানে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে চিন্তা করা দুরূহ ব্যাপার। তাই অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বুঝতে হলে অবশ্যই অর্থ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই ইউনিটের চারটি পাঠে আমরা অর্থের সংজ্ঞা, যোগান, পরিমাণ, গুরুত্ব, কার্যাবলী, ঐতিহাসিক স্তরসমূহ, পরিমাণ তত্ত্ব ও চাহিদা তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

❖ পাঠ-১ : **অর্থের সংজ্ঞা, যোগান ও পরিমাণ**

❖পাঠ.২**অর্থের কার্যাবলী ও গুরুত্ব, অর্থের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ**

❖ পাঠ-৩ :**অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব**

❖ পাঠ-৪ : **অর্থের চাহিদা তত্ত্ব**

পাঠ ১

অর্থের সংজ্ঞা, যোগান ও পরিমাণ

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- অর্থের সংজ্ঞা
- অর্থের যোগান
- মুদ্রামান ব্যবস্থা
- ঋণ ও ঋণপত্র

অর্থ বলতে কি বোঝায়? এর উত্তর সবারই জানা, অথচ খুব সীমিত সংখ্যক মানুষই এর সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারেন।

মানব সভ্যতার গোড়ার দিকে দ্রব্যভিত্তিক বিনিময় হত। এরপর নানারকম দ্রব্য অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তী পর্যায়ে মূল্যবান ধাতু [সোনা, রুপা ইত্যাদি] অর্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরপর আসে কাগজী মুদ্রার যুগ। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যাংক ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের ফলে চেকের দ্বারা হস্তান্তর যোগ্য ব্যাংকের আমানতও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এসব ধরনের অর্থের উদ্ভবের কারণ হলো এগুলোর সাধারণ গ্রাহ্যতা বা বিনিময়যোগ্যতা। এতদসত্ত্বেও অর্থের সংজ্ঞা নিরূপণে অর্থনীতিবিদরা ঐকমত্য দেখাতে পারেননি। অধ্যাপক ক্রাউথারের ভাষায়, 'অর্থ হলো যে কোনো দ্রব্য যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে [অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের উপায় হিসাবে] সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং যা যুগপৎ মূল্য পরিমাপের ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে'। অধ্যাপক রবার্টসনও একই সুরে অর্থের সংজ্ঞা দিয়েছেন। উপর্যুক্ত সংজ্ঞাটির গুরুত্ব দুটি। প্রথমত, অর্থ হতে হলে তা সর্বজনগ্রাহ্য হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে কোনো দ্রব্য সর্বজনগ্রাহ্য হলে তা অর্থ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। এই কারণেই ধাতব মুদ্রা, কাগজী মুদ্রা ও চেকের দ্বারা হস্তান্তর যোগ্য ব্যাংকের চলতি আমানত বা চাওয়ামাত্র আমানতকে (demand deposits) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম। আবার, অনেকে সর্বজনগ্রাহ্যতার আলোকেও অর্থের সংজ্ঞা দেন। দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে যা কিছু সর্বজনগ্রাহ্য তাকে অর্থ বলে। অবশ্য বর্তমান অর্থের সর্বজনগ্রাহ্যতা আইনবলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। বিনিময়যোগ্যতা এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা ছাড়াও যে দ্রব্য মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের ভান্ডার এবং ঋণ পরিশোধের উপায় হিসাবে কাজ করে তাকে অর্থ বলে। তাই অর্থের সংজ্ঞা হলো, 'যা কিছু অর্থের কাজ সম্পন্ন করে তাকেই অর্থ বলে'।

বিনিময়যোগ্যতা এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা ছাড়াও যে দ্রব্য মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের ভান্ডার এবং ঋণ পরিশোধের উপায় হিসাবে কাজ করে তাকে অর্থ বলে।

অর্থের যোগান

অর্থ হলো এমন একটি দ্রব্য যা পরিমাপযোগ্য, যদিও অর্থের যোগানের পরিমাপ পরীক্ষামূলক বা গবেষণামূলক ব্যাপার (empirical matter)। আমরা অর্থের যোগান পরিমাপের বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়ে অর্থের যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থার চাহিদা আমানত বা আমানতী দেনার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করব।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণকে অর্থের যোগান বলে। মনে রাখতে হবে অর্থের পরিমাণ হলো একটি তহবিল (stock) ধারণা। অপরদিকে অর্থের পরিমাণের পরিবর্তন হলো প্রবাহ (flow) ধারণা আবার অর্থের পরিমাণ বলতে জনসাধারণের হাতে অর্থের যোগানকে বোঝায়। এখানে

জনসাধারণ বলতে সরকার ও ব্যাংকব্যবস্থা ব্যতীত প্রতিটি অর্থনৈতিক একককে [যেমন ব্যক্তি, উৎপাদনী সংস্থা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে] বোঝায়। জনসাধারণের মধ্যে সরকার ও দেশের ব্যাংকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, কারণ এগুলো হলো অর্থের যোগানদাতা।

অর্থের যোগান বোঝানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাংক চারটি প্রতীক (symbols) ব্যবহার করে : M_1, M_2, M_3 ও M_4| M_1-এর উপাদান হলো জনসাধারণের নিকট কাগজী মোট ও ধাতব মুদ্রা এবং বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাংকের মোট চাহিদা আমানত ও রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট 'অন্যান্য আমানত'। M_2 হলো M_1 এবং ডাকঘর সঞ্চয়ে ব্যাংকের আমানতের যোগফল। M_2 এবং ব্যাংকের সময় আমানত বা স্থায়ী আমানতের যোগফল নিয়ে M_3 গঠিত হয়। পরিশেষে, M_4 এবং ডাকঘরের মোট আমানত যোগ করে M_4 পাওয়া যায়। সাধারণভাবে অবশ্য অর্থের যোগান বলতে M_1-কেই বোঝায়।

এখানে বলা দরকার যে, আমরা আলোচনার সুবিধার্থে অর্থের যোগানের সঙ্কীর্ণ পরিমাপটিই ব্যবহার করব- অর্থাৎ, M_1 ধারণাটি। আগেই বলা হয়েছে M_1 হলো জনসাধারণের নিকট কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা এবং দেশের মোট চাহিদা আমানতের উপাদান নিয়ে গঠিত। সাংকেতিক ভাষায় $M_1=C_p+D$ এখানে C_p বলতে জনসাধারণের নিকট অর্থ (currency with the public) এবং D বলতে চাহিদা আমানতকে বোঝায়। যেহেতু অ-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থার আমানত লেনদেন নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেহেতু ঐ সব সংস্থার আমানত অর্থের যোগানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এদের আমানতগুলো 'অর্থ' নয়, প্রায়-অর্থ। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Prof. Samuelson) মন্তব্য করেন যে, অর্থের যোগানের প্রকৃত সংজ্ঞা রুচির ব্যাপার, বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তার ব্যাপার নয়।

মুদ্রামান ব্যবস্থা

কোন্ দেশ কি ধরনের মুদ্রামান ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থারউপর নির্ভর

যে পদ্ধতির দ্বারা দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে মুদ্রামান ব্যবস্থা (Monetary Standards) বলে। এক কথায়, মুদ্রা প্রচলনের পদ্ধতি ও অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয় তাকে মুদ্রামান ব্যবস্থা বলে। কোন্ দেশ কি ধরনের মুদ্রামান ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত ও সার্থক মুদ্রামান ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকটি বিচার করা হয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রধান বা মানমুদ্রার (standard monetary unit) প্রচলনের পদ্ধতি ও অভ্যন্তরীণ অর্থের মূল্য বা দামস্তর স্থিতিশীল রাখা হয়। অন্যদিকে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থের বহির্মূল্যে বা বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ মুদ্রামান ব্যবস্থার সাহায্যে করা হয়ে থাকে। মুদ্রামান ব্যবস্থার সার্থকতা ও দক্ষতা এই কাজগুলোর সাফল্যের দ্বারা বিচার করা হয়।

মুদ্রামান ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত যত রকমের মুদ্রামান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলো প্রধানত দু' প্রকারের : (১) ধাতব মুদ্রা (metallic standard) এবং (২) অধাতব মুদ্রামান (non-metallic standard)। ধাতব মুদ্রামান আবার দু' ধরনের- এক ধাতুমান (mono-metallism) এবং দ্বিধাতুমান (bimetallism) একধাতুমানকে আবার দু' ভাগে ভাগ করা যায় : স্বর্ণমান (gold standard) এবং রৌপ্যমান (silver standard)। স্বর্ণমান চার প্রকার- ক. স্বর্ণমুদ্রামান (gold currency standard), খ. স্বর্ণপিন্ডমান (gold bullion standard), গ. স্বর্ণবিনিময়মান (gold exchange standard) এবং ঘ. স্বর্ণসমতামান (gold parity standard)। অধাতব মুদ্রামান বলতে কাগজী মুদ্রামানকে (paper standard) বোঝায়। নিচের ছকটিতে মুদ্রামান ব্যবস্থার প্রকারভেদ দেখানো হলো-

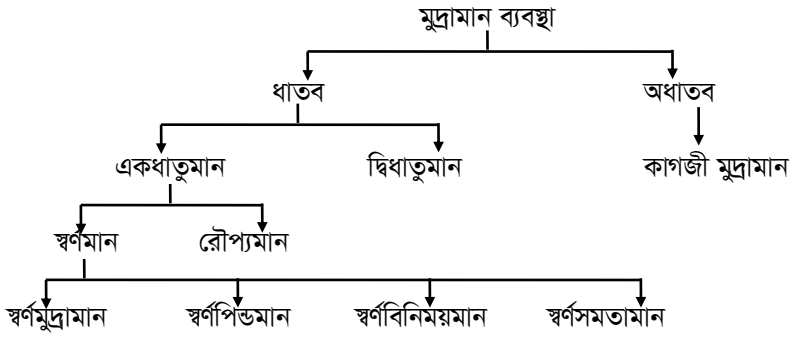

প্রতিটি মুদ্রামান ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো-

একধাতুমান

একধাতুমান ব্যবস্থায় আইনসিদ্ধ মানমুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য নামক ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই মুদ্রামান ব্যবস্থায় ধাতু নির্মিত মুদ্রাই অসীম বিহিত (unlimited legal tender) মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে। যে মুদ্রায় মুদ্রার আদান-প্রদান, ঋণগ্রহণ বা পরিশোধ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। বিহিত মুদ্রা অসীম ও সসীম হতে পারে। যে সমস্ত মুদ্রা দেনা-পাওনা মেটানো ও বিনিময়ের জন্য যে কোনো পরিমাণ দেয়া যায় তাকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলে। অপরদিকে, সসীম বিহিত মুদ্রা হলো যা বিনিময় ও দেনা পাওনা মেটানোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি দিলে লোকে নিতে অস্বীকার করে। একধাতুমানের বৈশিষ্ট্য হলো- ১. আইনসিদ্ধ মানমুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত হয়, ২. মানমুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা, ৩. সরকারের খাজাঞ্চিখানা বা টাকশাল সোনা বা রুপা নিয়ে বিনা ব্যয়ে বা অতি স্বল্প ব্যয়ে সোনা বা রুপার টাকা সরবরাহ করার ভার নেয় (free coinage), ৪. সোনা বা রুপার অবাধ আমদানি-রপ্তানি থাকে, ৫. কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও তা ধাতব মুদ্রায় ভাঙিয়ে দেবার (convertible) ব্যবস্থা থাকে। গ্রেট ব্রিটেনে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একধাতু স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল।

দ্বিধাতুমান

যে মুদ্রামান ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতু দ্বারা প্রস্তুত দু'প্রকারের মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকে তাকে দ্বিধাতুমান বলে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিধাতুমান ইংল্যান্ড ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চালু ছিল। স্বর্ণমানের আবির্ভাবের পর থেকে দ্বিধাতুমানের শ্রেষ্ঠতা নষ্ট হয়।

বৈশিষ্ট্য : ১. দুটি ধাতুর, প্রধানত সোনা বা রৌপ্য মুদ্রা দেশের মানমুদ্রা ও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে, ২. ধাতু দুটির বিনিময় হার ধাতু দুটির মূল্যের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। ধরা যাক, সোনার দাম রুপার দশগুণ। একটি সোনার মুদ্রায় যদি ১ তোলা সোনা ও একটি রুপার মুদ্রায় যদি ১ তোলা রুপা থাকে তাহলে ১টি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ১০টি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যাবে। একে বলে বিনিময় হার বা টাকশালের দর (mint rate), ৩. দুটি ধাতুরই অবাধ মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ যে কেউ সোনা বা রূপা নিয়ে সরকারের টাকশাল থেকে বিনা ব্যয়ে সোনা বা রুপা টাকা পেতে পারে। উপরের উদাহরণে সোনা ও রুপার বিনিময় মূল্য ১:১০ ঠিক করা হয়েছে। বাজারে যদি ১ তোলা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ১১ তোলা রৌপ্য পাওয়া যায় তবে লোকে স্বর্ণমুদ্রা গলিয়ে রৌপ্য সংগ্রহ করবে। অপরদিকে টাকশালের দর যেহেতু ১:১০ সেহেতু বাজারে ১ তোলা সোনার পরিবর্তে ১১ তোলা রুপা পাওয়া যাবে না। তাই বাজারে যাতে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রার মূল্যের পার্থক্য না দেখা দেয় সেজন্য অবাধ মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা থাকে। সোনা ও রুপার অবাধ আমদানি-রপ্তানি থাকে।

স্বর্ণমান

ধাতব মুদ্রামান ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্যমুদ্রা উভয় ধাতু নির্মিত মুদ্রা অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে। স্বর্ণমানের অধীনে স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে। অবশ্য স্বর্ণমুদ্রা চালু না করে কাগজী মুদ্রার দ্বারাও স্বর্ণমান বজায় রাখা যায়। কাগজী মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রায় কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার পরিবর্তে সরকারি টাকশাল থেকে তা ভাঙানোর ব্যবস্থা থাকলে তাকে স্বর্ণমান বলে।

বৈশিষ্ট্য : ১. স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশের বিহিত মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট ওজনের সোনার মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ২. এতে অবাধ মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা আছে। এর অর্থ হলো নির্দিষ্ট ওজনের সোনা টাকশালে জমা দিলে তা বিনামূল্যে বা অতি অল্প ব্যয়ে ভাঙিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। অথবা, কাগজী টাকা চালু থাকলে তা স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তরকরণের ব্যবস্থা থাকে। ৩. দেশের মোট অর্থের পরিমাণ সোনার সংরক্ষিত তহবিলের উপর নির্ভর করে। দেশে সোনা ও অর্থের পরিমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। স্বর্ণের পরিমাণ বেড়ে [কমে] গেলে দেশে অর্থের পরিমাণ বেড়ে [কমে] যাবে। ৪. এতে সোনার অবাধ আমদানি-রপ্তানি থাকে। ৫. স্বর্ণমানের অধীনে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে নিজে থেকেই স্থির হয়। এই স্বয়ংক্রিয়তা (automatDcity) স্বর্ণমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য মূল্যমান ব্যবস্থার মতো স্বর্ণমানের দুটি উদ্দেশ্য আছে- অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখা এবং অর্থের বহির্মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখা। স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় গতিবিধির দরুণ অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য ও বহির্মূল্য স্থিতিশীল করে লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। তাই স্বর্ণমান স্বয়ংক্রিয় মুদ্রামান ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয়তা দাম স্বর্ণ প্রবাহ প্রক্রিয়ার (price-specie-flow mechanism) দ্বারা আনয়ন করা হয়। দেশের মধ্যে স্বর্ণের আগমন ও নির্গমন অবাধ হওয়ায় লেনদেনের উদ্বৃত্তে আপনাআপনি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় বলে একে স্বয়ংক্রিয় স্বর্ণপ্রবাহ দাম প্রক্রিয়া বলে। কোনো দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তের প্রতিকূলতা [আমদানি>রপ্তানি] দেখা দিলে দেশ থেকে সোনা বাইরে চলে যাবে। ফলে অর্থের পরিমাণ সঙ্কুচিত হবে ও দামস্তর [অভ্যন্তরীণ] কমে আসবে। দামস্তর হ্রাস পাওয়ায় ঐ দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ও সোনা দেশে প্রবেশ করবে। অপরদিকে লেনদেনের উদ্বৃত্তে অনুকূল [রপ্তানি>আমদানি} অবস্থা ঘটলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

স্বর্ণমানের প্রকারভেদ

স্বর্ণমান চার প্রকার- ১. স্বর্ণমুদ্রামান- স্বর্ণমানের শ্রেষ্ঠ রূপ, ২. স্বর্ণপিন্ডমান, ৩. স্বর্ণবিনিময়মান এবং ৪. স্বর্ণসমতামান।

কাগজী মুদ্রা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই কাগজী মুদ্রামান প্রচলিত হয়। কাগজী মুদ্রামান ব্যবস্থায় অথবা নিয়ন্ত্রিত মুদ্রামান ব্যবস্থায় অথবা আদিষ্ট মুদ্রামান (fiat standard) ব্যবস্থায় কাগজের টাকাই হলো দেশের মান এবং বিহিত মুদ্রা (legal tender money)। অবশ্য ধাতব মুদ্রামান ব্যবস্থাতেও কাগজের টাকাকড়ি প্রচলিত থাকে এই ধরনের মুদ্রাকে প্রতিনিধি মুদ্রা (representative money) বলে। যা নিজে মুদ্রা নয় অথচ যথার্থ মুদ্রার পরিবর্তকরূপে দেশে চালু থাকে এবং চাওয়ামাত্র যথার্থ মুদ্রায় রূপান্তরযোগ্য তাকে প্রতিনিধি মুদ্রা বলে। কাগজী মুদ্রামান ব্যবস্থা স্বল্পমূল্যের ধাতব মুদ্রা অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকতে পারে। কাগজী মুদ্রা সরকার ও ব্যাংক প্রচলন করে থাকে। কাগজী টাকাকড়ি দু'রকমের হতে পারে- পরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয়। অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রাকে আদিষ্ট মুদ্রা (fiat money) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে কাগজী মুদ্রা মাত্রই অপরিবর্তনীয়। কাগজী মুদ্রার পরিমাণ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে। দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী মুদ্রা প্রচলন করে। অন্য দেশের কাগজী মুদ্রার সঙ্গে দেশের কাগজী মুদ্রার বিনিময় হার সরকার নির্ধারণ করে।

ঋণ ও ঋণপত্র

আমরা দেখেছি যে বিনিময় সম্পাদন করাই অর্থের প্রাথমিক কাজ। কিন্তু বিনিময় অর্থ ছাড়াও চেক, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। তবে এগুলোকে অর্থ না বলে অর্থের পরিবর্ত (money substitutes) বা 'ঋণপত্র' (Credit instruments) নামে অভিহিত করা হয়। সভ্য জগতে লেনদেনের কাজকারবারের একটা মোটা অংশ ক্রেডিট বা ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলে বিনিময় ব্যবস্থায় এসব ঋণপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

বিনিময় অর্থ ছাড়াও চেক, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

ভিত্তি : ক্রেডিট বলতে ঋণ বা ঋণের কারবার বোঝায়। ক্রেডিটের বাংলা প্রতিশব্দ হলো বিশ্বাস। বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি। বিশ্বাস আছে বলেই দোকানদার ধারে জিনিসপত্র দেয়, ব্যাংক ঋণ প্রদান করে, লোকে ব্যাংকে টাকা আমানত রাখে ইত্যাদি। এসব কাজকারবারের মূল্যে থাকে একটি করে প্রতিশ্রুতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হলে আইন-আদালতে তার প্রতিকার পাওয়া যায়। কিন্তু আইন-আদালত পাওনা আদায়ের নির্দেশ দিতে পারে মাত্র, আদায় করে দিতে পারে না। দেনাদারের যদি পাওনা মেটাবার ক্ষমতা না থাকে, বা ইতিমধ্যে যদি সে দেউলিয়া হয়ে পড়ে অথবা আইনকে ফাঁকি দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করে ফেলে তবে পাওনাদারের পক্ষে আদালতের নির্দেশ বা ডিক্রি নিয়ে বিশেষ কিছু করার থাকে না। সুতরাং আইন-আদালতে বলবৎযোগ্যতা নয়, পারস্পরিক বিশ্বাসই ঋণের মূল ভিত্তি।

বৈশিষ্ট্য : ঋণের সঙ্গে যে সময়ের প্রশ্ন জড়িত আছে, এ ধারণাও উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে করা যাবে। আজ ঋণগ্রহীতা পাওনা মেটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো, কিন্তু পাওনা মেটাবার সময় তার ইচ্ছা বা সঙ্গতি অন্যরূপ হতে পারে। সুতরাং ঋণের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো- ক. বিশ্বাস এবং খ. সময়।

ঋণের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরিত হয়। ফলে যে ব্যক্তি সম্পদের মালিক নয় সে স্বল্পকালের জন্য তা ভোগ বা ব্যবহার করার অধিকারী হয়। ঋণ বলতে সোজাসুজি দ্রব্য সামগ্রীর হস্তান্তর ও তা ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতিও বোঝাতে পারে। যেমন, আমাদের দেশে কৃষকদের অনেকেই ফসল বোনার সময় ধানচালের ঋণ নিয়ে থাকে। ফসল ওঠার পর কৃষকদের ঋণ নেয়া ধান চাল সুদসহ ফেরত দিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থই ঋণ দেয়া হয়। ফলে ঋণের কারবার হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে ভবিষ্যতে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি।

ঋণপত্র : ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি মৌখিক এবং লিখিত দু'প্রকারের হয়। শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে আদালতে উপস্থিত হওয়া যায় না, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্যপ্রমাণাদিও উপস্থিত করতে হয়। লিখিত প্রতিশ্রুতি কিন্তু এককভাবেই আদালতে বলবৎযোগ্য, সাধারণ ক্ষেত্রে এর উপর সাক্ষ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন হয় না। লিখিত প্রতিশ্রুতি শুধু খাতায় লেখা থাকতে পারে, আবার তা ঋণপত্রেও নিবদ্ধ করা যেতে পারে। গৃহস্থের কাছ থেকে পাওনার হিসাব যদি শুধু মুদির খাতায় লেখা না থেকে হাতচিঠাতে ওঠানো হয় এবং তা যদি মুদির কাছে জমা থাকে তবে ঐ হাতচিঠা হলো ঋণপত্র। এই ঋণপত্র অবশ্য হস্তান্তর যোগ্য (negotiable) নয়। এতে লিখিত পাওনা স্বয়ং মুদিকেই আদায় করতে হবে। প্রথম প্রথম এই ধরনের হস্তান্তর যোগ্যতাধীন ঋণপত্রই ব্যবহৃত হতো। পরে হস্তান্তর যোগ্য ঋণপত্রের প্রচলন হয়। স্বর্ণকারের কাছে অর্থ জমা রাখলে যে রসিদ পাওয়া যেত তা ক্রমে হস্তান্তরিত হতে লাগল। যেমন, রহিমের কাছে টাকা জমা রেখে জালাল যে রশিদ পেল তা দিয়ে সে আবুলের কাছ থেকে মাল ক্রয় করতে সমর্থ হলো। এর ফলে জালালের নয়, আবুলের টাকা স্বর্ণকারের কাছে জমা রইল। এভাবে হস্তান্তর যোগ্য ঋণপত্র ব্যবহারের যে সুচনা হয় তা দীর্ঘদিন ধরে ক্রমবিকশিত হয়ে বর্তমান দিনের ব্যবসা-বাণিজ্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র

বর্তমানে নিম্নলিখিত ধরনের ঋনপত্র দেখা যায় :

ক. প্রতিশ্রুতিপত্র : প্রতিশ্রুতিপত্র (promissory note) দ্বারা ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অথবা চাওয়ামাত্র ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। প্রতিশ্রুতিপত্র সাধারণ হস্তান্তর যোগ্য হয়; ঋণদাতা

এই পত্র অপরের কাছে বিক্রি করতে পারে। ঋণ ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিশ্রুতিপত্রের বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করে থাকে। এ ধরনের প্রতিশ্রুতিপত্র সাধারণত 'হ্যান্ডনোট' বলে পরিচিত।

আমানত (deposit) থেকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করার জন্য আমানতকারী ব্যাংকের উপর যে লিখিত আদেশ দেয় তাকেই চেক বলে। সাধারণত চেক হস্তান্তরযোগ্য প্রতিশ্রুতিপত্র।

খ. চেক : আমানত (deposit) থেকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করার জন্য আমানতকারী ব্যাংকের উপর যে লিখিত আদেশ দেয় তাকেই চেক বলে। সাধারণত চেক হস্তান্তর যোগ্য প্রতিশ্রুতিপত্র। তবে নিরাপত্তার জন্য যার নামে চেক কাটা হয়েছে তাকেই অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে হস্তান্তর যোগ্যতাহীন করা যেতে পারে। চেক আবার রেখাঙ্কিত বা দাগকাটা (crossed) হয়। এই চেক সোজাসুজি ব্যাংকে নিয়ে গেলে নগদ টাকা পাওয়া যায় না। চেকটিকে প্রথমে ব্যাংকে জমা দিতে হয়, ব্যাংকে জমা দেয়া হলে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চেক কেটেছে তার আমানত থেকে যার নামে চেক কাটা হয়েছে তার আমানত টাকা স্থানান্তরিত হয়। তখন সে ইচ্ছা করলে নগদ টাকা তুলে নিতে পারে। ধরা যাক, জালাল সাহেব অফিস থেকে চেকে বেতন পেয়েছেন এবং এই চেক হলো রেখাঙ্কিত চেক। জালাল সাহেবকে ঐ চেকখানি প্রথমে নিজের ব্যাংকে জমা দিতে হবে। তখন তার ব্যাংক যে অফিস চেক প্রদান করেছে তার ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে জালাল সাহেবের আমানতের ঘরে জমা করবে। জমা হলে পরে জালাল সাহেব নিজে চেক কেটে নগদ টাকা তুলে নিতে পারবেন। আর অফিসের ব্যাংক ও জালাল সাহেবের ব্যাংক যদি একই ব্যাংক হয় তবে জালাল সাহেব চেকখানি জমা দিলেই অফিসের হিসাব থেকে তার হিসাবে লিখিত পরিমাণ টাকা হস্তান্তরিত হবে। সাধারণ হস্তান্তর যোগ্য চেক অপেক্ষা এই ধরনের রেখাঙ্কিত চেক নিরাপদ। কারণ, ব্যাংকের মাধ্যমেই তা ভাঙাতে পারা যায়। একটি ব্যাংক অপর একটি ব্যাংকের উপর চেক কাটলে তাকে 'ব্যাঙ্কার্স ড্রাফট' (Banker'sDraft) বলে।

ব্যাংক আমানতকেই ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ এবং চেককে অর্থের পরিবর্ত বা ঋণপত্র বলে গণ্য করা হয়।

চেক অর্থ নয় কেন : প্রশ্ন উঠতে পারে, চেককে অর্থ বলে গণ্য না করে ঋণপত্র বলে গণ্য করা হয় কেন? এর একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, ব্যাংকের আমানত না থাকলে চেকের কোনো মূল্য নেই। দ্বিতীয়ত, চেকের মাধ্যমে লেনদেনের কাজ একবারেই সমাপ্ত হয় না, আমানত স্থানান্তরিত করার বা টাকা তুলে নেওয়ার কাজ তখনও বাকি থাকে। তৃতীয়ত, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে চেক একখন্ড কাগজেরই শামিল হয়। চতুর্থ সব চেক হস্তান্তর যোগ্য নয়। অতএব, ব্যাংক আমানতকেই ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ এবং চেককে অর্থের পরিবর্ত বা ঋণপত্র বলে গণ্য করা হয়।

গ. হুন্ডি বা বিল অব এক্সচেঞ্জ : 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'কে বাংলায় হুন্ডি বলে অভিহিত করা হলেও যাকে ঠিক হুন্ডি বলে তার সঙ্গে প্রকৃত বিল অব এক্সচেঞ্জের পার্থক্য আছে। হুন্ডি লেখা হয় দেশী ভাষায়, বিল অব এক্সচেঞ্জ লেখা হয় ইংরেজিতে। কতকগুলো হুন্ডি প্রতিশ্রুতিপত্রেরই মতো, আবার কতকগুলো বিল অব এক্সচেঞ্জের ধরনের। মোট কথা, বিল অব এক্সচেঞ্জের বাংলা প্রতিশব্দ হুন্ডিই করে এই প্রকৃতি বর্ণনা করা হলো :

হুন্ডি কিভাবে ব্যবহৃত হয় : একদিক থেকে হুন্ডির প্রকৃতি প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রকৃতির বিপরীত। প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করে ঋণগ্রহীতা হুন্ডিতে অর্থপ্রদানের নির্দেশ দেয় মাল বিক্রেতাকে। মাল বিক্রেতার নির্দেশপত্রের ক্রেতা সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করলে তবেই তা হুন্ডিতে পরিণত হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, ঢাকার জনাব রবিউল হাসান ব্যবসায়ী লন্ডনের মিঃ ম্যাকেঞ্জির কাছে ১ হাজার পাউন্ড মূল্যের যন্ত্রপাতি তিন মাস পরে দাম দেয়ার অঙ্গীকার করে ক্রয় করলেন। এখন মিঃ ম্যাকেঞ্জি জনাব হাসানের নামে একটি বিল কেটে পাঠাবেন। জনাব হাসান তা 'স্বীকার করলাম' বলে সই করলে তা হুন্ডিতে পরিণত হবে। এই হুন্ডি তিন মাস পরে জনাব হাসানের কাছে প্রেরণ করলে তিনি ১ হাজার পাউন্ড দিতে আইনত বাধ্য থাকবেন। এই তিন মাসের আগেই যদি মিঃ ম্যাকেঞ্জির টাকার দরকার হয় তবে কোনো ব্যাংকের কাছ থেকে ঐ হুন্ডি তিনি বাট্টা করে নিতে পারেন। সময়ান্তরে ব্যাংক জনাব হাসানের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবে। এভাবে হুন্ডির সাহায্যে ব্যবসায়ীরা ধারে মালপত্র কিনেও আমদানি করে থাকে। এ ছাড়াও হুন্ডির সাহায্যে আমদানি-রপ্তানির মূল্য সহজে মেটানো যায়। কিভাবে তা সম্ভব হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে করা হলো।

হুন্ডি ও বিলের বাজার :উপরের উদাহরণে জনাব হাসান মিঃ ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে ধারে মাল আমদানি করেছেন। সুতরাং তিন মাস পরে জনাব হাসানের সমস্যা হবে কি করে লন্ডনে মিঃ ম্যাকেঞ্জিকে টাকা পাঠানো যায়। যদি ধরা যায়, ঐ একই সময় ঢাকার ব্যবসায়ী জনাব আহমেদের কাছ থেকে লন্ডনের আমদানিকারক মিঃ টমাস ঐ ১ হাজার পাউন্ড মূল্যের মাল আমদানি করেছেন তবে সমস্যাটি সহজে মিটে যেতে পারে। জনাব হাসান জনাব আহমেদের কাছ থেকে মিঃ টমাসের স্বীকার করা হুন্ডিটি কিনে মিঃ ম্যাকেঞ্জিকে পাঠালে মিঃ ম্যাকেঞ্জি মিঃ টমাসের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিতে পারেন। ফলে জনাব আহমেদ তার রপ্তানির মূল্য ঢাকার ব্যবসায়ী জনাব হাসানের কাছ থেকে এবং মিঃ ম্যকেঞ্জি তার রপ্তানির মূল্য লন্ডনেরই মিঃ টমাসের কাছ থেকে পাবেন। সুতরাং, কাউকেও বিদেশ থেকে টাকা আদায়ের বা বিদেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে না। এভাবে হুন্ডি বা বিল ক্রয় বিক্রয়ের জন্য প্রায় প্রত্যেক উন্নত দেশেই বিলের বাজার (bill market) আছে এবং বর্তমানে হুন্ডি অন্তর্বাণিজ্য ও বর্হিবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ঘ. তমসুক : অন্যান্য ধরনের ঋণপত্রের মধ্যে তমসুকই (bonds) প্রধান। তমসুক মোটামুটি দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র। ডিবেঞ্চার (debenture) তমসুকের অন্যতম উদাহরণ।

সারসংক্ষেপ

বিনিময়যোগ্যতা এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা ছাড়াও দ্রব্য মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের ভান্ডার এবং ঋণ পরিশোধের উপায় হিসাবে কাজ করে তাকে অর্থ বলে। মুদ্রামান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো দেশ কি ধরনের মুদ্রামান ব্যবস্থা গ্রহন করবে তা সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের মুদ্রামান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. অর্থের উদ্ভবের কারণ হলো এর সর্বজনগ্রাহ্যতা। সত্য/মিথ্যা
২. M_1-এর উপাদান হলো শুধু জনসাধারণের কাছে কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা। সত্য/মিথ্যা
৩. M_2 হলো M_1 এবং ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাংকের আমানতের যোগফল। সত্য/মিথ্যা
৪. কোনো দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে প্রতিকূলতা হলে দেশ থেকে স্বর্ণ বাইরে চলে যাবে। সত্য/মিথ্যা
৫. ঋণের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরিত হয় না। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থের সংজ্ঞা কি?
২. M_1, M_2, M_3, ও M_4 কি?
৩. কাগজী মুদ্রা বলতে কি বোঝায়?
৪. চেক কি?
৫. হুন্ডি কিভাবে ব্যবহৃত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংজ্ঞাসহ অর্থের যোগান আলোচনা করুন।
২. মুদ্রামান ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? এর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করুন।
৩. ঋণ ও ঋণপত্র কি? ঋণপত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রের বিবরণ দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য ৪. সত্য ৫. মিথ্যা

পাঠ ২

অর্থের কার্যাবলী ও গুরুত্ব, অর্থের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- অর্থের কার্যাবলী
- অর্থের গুরুত্ব
- অর্থের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ

অর্থের বহুবিধ ব্যবহারে আমরা এতোটাই অভ্যস্ত যে এর অসাধারণত্ব বুঝতে পারি না। আধুনিক বিনিময় অর্থনীতি অর্থ ছাড়া অচল। অর্থের প্রবাহ নেই এমন অর্থনীতি কল্পনাতীত। আগের দিনে পণ্য বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা হতো। দু'পক্ষের বিনিময়েই শুধু ব্যবসা হতো। যদি একজন অর্থনীতিবিদ তার চুল কাটাতে চাইত তাহলে তাকে এমন নাপিতকে খুঁজে বের করতে হতো যে অর্থনীতি সম্পর্কে লেকচার শুনতে আগ্রহী। তেমনিভাবে কোনো অভিনেতা কাপড় বানাতে চাইলে তাকে এমন দর্জি খুঁজে বের করতে হতো যে কিনা সিনেমা-থিয়েটারে আগ্রহী। তখন এভাবে চলতো। আধুনিক সভ্যতা অবশ্য বিনিময় মাধ্যম ছাড়া অচল।

অর্থের চারটি সনাতনী কার্যাবলী আছে। এর মধ্যে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কাজ করাটা প্রথম। অন্যগুলো হলো হিসাবের একক, মূল্যের পরিমাপক ও বকেয়া পরিশোধের ভিত্তি।

অর্থ বিনিময় মাধ্যম হওয়ায় দ্বৈত চাহিদার প্রয়োজন কমেছে। আগের দিনে এক পক্ষ অন্য পক্ষের চাহিদা পূরণে সক্ষম হলেও বিনিময় হতো, ব্যবসা হতো। ব্যাপারটি অনেকটা অভিনেতা-দর্জির মতো। এক পক্ষের চাহিদা না থাকলে অন্য পক্ষ ব্যবসা করতে বা বিনিময় করতে পারত না।

অর্থের চারটি সনাতনী কার্যাবলী আছে। এর মধ্যে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কাজ করাটা প্রথম। অন্যগুলো হলো হিসাবের একক, মূল্যের পরিমাপক ও বকেয়া পরিশোধের ভিত্তি।

বিনিময়ের মাধ্যম :

বিনিময় মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত হওয়াতেই বাকি কার্যাবলীগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে। মূল্যের পরিমাপক বলতে বোঝায় সময় ক্ষেত্রে সম্পদের মূল্য নির্ণয়। কোনো ব্যক্তি কোনো সম্পদ ধারণ করলে বর্তমানেই সে ভবিষ্যতের বিনিময় চুক্তি করতে পারে। মূল্যের পরিমাপক না হলে টাকা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। বর্তমানের ধারণকৃত সম্পদ ভবিষ্যতে বিক্রির চুক্তি করা যেত না। অর্থের জায়গায় আইসক্রিম ব্যবহার করলে কি হতো চিন্তা করুন। টাকা যদি মিনিট কয়েকের মধ্যে গলে যেত তাহলে কি আইসক্রিম রেখে মানুষ টাকা জমাতো? আর বিক্রেতারা যদি বিনিময় মাধ্যম হিসেবে আইসক্রিম গ্রহণ না করতো তাহলে কি হতো? যাই হোক, অর্থ ছাড়াও বিনিময় মাধ্যম হিসেবে আধুনিক যুগে বন্ড, স্টক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

হিসাবের একক :

হিসাবের একক বলতে বোঝায় যে সংখ্যায় মূল্য রেকর্ড করা হয় বা হিসাব রাখা হয়। মূল্য হিসাব করা হয় অর্থে। আর অর্থ হলো সেই একক যার মাধ্যমে স্টক, টাকার প্রবাহ ইত্যাদি মাপা হয়। বেশিরভাগ দেশেই স্থানীয় মুদ্রা হিসাবের একক। যদিও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির দেশগুলোতে ডলার হিসাবের একক বলে গণ্য হয়। যদিও স্থানীয় মুদ্রা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত।

মূল্যের পরিমাপক :

পণ্য বিনিময় ব্যবস্থায় অসংখ্য বিনিময় হার থাকায় দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনে অসুবিধা দেখা দেয়। অপরদিকে, অর্থ যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেনের মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে। পণ্য বিনিময়ের যুগে বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য পরিমাপের কোনো সঠিক মাপকাঠি না থাকায় বিনিময় হার নির্ধারণ করা যেত না। কিন্তু সমস্ত দ্রব্যের মূল্য অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায়। দ্রব্যের মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে অর্থ ব্যবহৃত হলে দুটি দ্রব্যের মূল্যের তুলনা করা যায়। যেমন, ক দ্রব্যের দাম যদি ২ টাকা এবং খ দ্রব্যের দাম যদি ৪ টাকা হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি যে ক দ্রব্যের তুলনায় খ দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ। অর্থাৎ, অর্থ মূল্য হিসাব করার একক হিসাবে কাজ করে। অর্থের মানেই সব দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়।

দ্রব্যের মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে অর্থ ব্যবহৃত হলে দুটি দ্রব্যের মূল্যের তুলনা করা যায়।

বকেয়া পরিশোধের ভিত্তি :

দীর্ঘমেয়াদি লেনদেন (যেমন ঋণ)-এর ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধের ভিত্তি হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হয়। ধার্যকৃত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। ধার্যকৃত অর্থই বকেয়া পরিশোধের ভিত্তি। তবে অর্থকেই বকেয়া পরিশোধের ভিত্তি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন ধরুন ঋণের শেষ কিস্তিটি ধার্যকৃত নাও হতে পারে। দু'পক্ষ ঠিক করতে পারে সামগ্রিক মূল্যের উপর কিস্তি কি পরিমাণ ধার্য হবে এমনতর ঋণকে সূচক ঋণ বলে। সাধারণত অর্থ শেষ দুটো কাজ করে থাকে। যদিও তা অত্যাবশ্যকীয় নয়। মূল্যের পরিমাপক হিসেবে অর্থ ছাড়া অন্যান্য সম্পদও ব্যবহৃত হয়।

যতো যাই হোক, অর্থের চেহারা যেমন হোক, অতীতে অর্থ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও বা সামুদ্রিক শামুক, কখনও ধাতব, অনেক সময় সোনা-রুপার পরিবর্তে কাগজের হিসাব। এখন কাগজের টাকা আছে, সেই সঙ্গে আছে ব্যাংকের ইলেক্ট্রনিক হিসাব। তবে টুকরো কাগজ মানেই টাকা নয়। কাগজটি তখনই টাকার সম্মান পাবে যখন তা পরিশোধের জন্য গৃহীত হবে। যে উপাদান দিয়েই বানানো হোক না কেন দাম পরিশোধের জন্য গৃহীত হলেই তা টাকা। এই কথাটি থেকে বোঝা যায়, ঐ বস্তুটিই টাকা যা দাম পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হয় এই আশায় যে পরবর্তী পক্ষও এটা গ্রহণ করবে।

অর্থের গুরুত্ব

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থের উদ্ভাবন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন বলে আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো অর্থ।

আধুনিক অর্থব্যবস্থা একান্তভাবে অর্থের উপর নির্ভরশীল, কারণ অর্থ ব্যবহারের সুবিধা অসীম। অর্থের উদ্ভাবনের ফলেই আধুনিক সমাজের মানুষকে আর সরাসরি দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় বিনিময় কার্যকলাপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। অর্থ ভোক্তাকে সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা এনে দিয়েছে, ক্রেতার স্বাধীনতা অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয়ের সুযোগ করে দিয়েছে অর্থ। এক কথায়, মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতায় অর্থের ভূমিকা অপরিসীম।

অর্থ উৎপাদককে তার কর্মপরিধি নির্ধারণে অর্থাৎ উৎপাদন ও বিক্রয়করণের কাজ সক্ষম করে তুলেছে। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী (যা ক্রেতার ব্যয়ের ধরন-ধারণে প্রতিফলিত হয়) উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। অর্থাৎ, অর্থই উৎপাদককে উৎপাদনের ধরন-ধারণ স্থির করতে সাহায্য করে। এক কথায়, উৎপাদকের উৎপাদন সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে অর্থ। স্বল্প উৎপাদনের উপকরণগুলোর নিয়োগের ব্যাপারেও উৎপাদকের কাছে অর্থের ভূমিকা যথেষ্ট। আবার, উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা নির্ধারণেও অর্থ সাহায্য করে। পরিশেষে, অর্থ উৎপাদককে অতিমাত্রায় বিশেষায়ণ ও বৃহদায়তনে উৎপাদন কার্য সম্পাদনে সক্ষম করেছে।

উৎপাদকের উৎপাদন সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে অর্থ।

অর্থের উদ্ভাবনের পরেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আকার নিতে সক্ষম হয়।

অর্থের ব্যবহারের ফলেই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বাচ্ছন্দ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে। অর্থের প্রচলনের সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট হয়। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে উঠেছে সহজভাবে। কার্যত, অর্থের উদ্ভাবনের পরেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আকার নিতে সক্ষম হয়।

ঋণ পরিশোধ ও অগ্রিম পাওনা মেটানোর ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করে। শ্রমিক তার মজুরি দ্রব্যোৎপাদন এবং তার বিক্রির আগেই পেয়ে থাকে অর্থের আকারে। অর্থের মাধ্যমে ঋণপ্রদান অনেক সহজতর কাজ। আবার, অর্থের অস্তিত্ব সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। সঞ্চয় আবার মূলধন গঠনে সহায়তা করে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়। যে কোনো আধুনিক সরকারের আয়সংগ্রহ, ব্যয়নির্বাহ ও অন্যান্য কার্যাবলী দ্রব্যের মাধ্যমে সম্পাদিত না হয়ে অর্থের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এক কথায়, সরকারি আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থের অবদান কম নয়।

সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, যে বর্তমান বিশেষায়ণ ও জটিল শ্রমবিভাগের যুগে অর্থ হলো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রয়োজনীয় বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থের উদ্ভাবন না ঘটলে আধুনিক সমাজের বর্তমান অবস্থার উদ্ভব ঘটত না, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে অর্থ নিছক বিনিময় ঘটানোর যন্ত্র নয়।

অর্থের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ

অর্থ যে কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার সময় নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, যদিও এর আবিষ্কারকে মানব সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অর্থের উদ্ভাবনের ইতিহাসে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হলেও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা উক্ত কাল্পনিকতাকে কখনো কখনো সমর্থন করেছে।

দ্রব্য অর্থ

প্রাচীন যুগে বিশেষ কোনো দ্রব্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। তবে ঐ দ্রব্য অর্থ হিসাবে বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্য অর্থের (commodity money) সর্বজনগ্রাহ্যতা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্রতটবর্তী এলাকার লোকেরা কড়ি, শাঁখ ইত্যাদিকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দিত। গবাদি পশুকেও দীর্ঘকাল ধরে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যে সমস্ত দ্রব্যাদিকে ব্যবহার করা হত সেগুলোকে 'দ্রব্য অর্থ' আখ্যা দেয়া হয়। তবে, এই সমস্ত দ্রব্য শুধু যে বিনিময়েই ব্যবহৃত হতো তা নয়, এগুলোর যথেষ্ট উপযোগিতা ছিল বলে এদের প্রত্যক্ষ চাহিদাও ছিল। এসব দ্রব্য মুদ্রা বিনিময়ের সার্বজনীন মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত না হওয়ায় সভ্যতার পরবর্তী ধাপে বিভিন্ন ধাতু মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল।

ধাতব মুদ্রা

অর্থ উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যাবতীয় দ্রব্য সমাজে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অর্থ হিসাবে মূল্যবান ধাতুর ব্যবহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উৎকৃষ্ট অর্থ হতে গেলে তার যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন [যেমন মূল্যের স্থিতিশীলতা, বিভাজ্যতা, সহজে চেনার যোগ্যতা, সর্বজনগ্রাহ্যতা ইত্যাদি] মূল্যবান ধাতুর (যথা- স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র) ঐ সব গুণাবলী থাকায় তা দীর্ঘকাল ধরে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের দুটি বিশেষ অসুবিধা প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, এইসব ধাতুর গুণাগুণ ও ওজন নির্ধারণ করা একটি বিশেষ কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। দ্বিতীয়ত, অল্প পরিমাণ লেনদেনের জন্য ধাতব মুদ্রাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা সহজতর ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে তা অসম্ভবই ছিল। আবার বড়সড় রকমের লেনদেনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধাতব মুদ্রার পরিবহনে অসুবিধাও কম ছিল না।

ধাতব মুদ্রা দ্রব্যমুদ্রার তুলনায় উৎকৃষ্ট হলেও উপর্যুক্ত অসুবিধাগুলোর জন্য ব্যাপকভাবে ধাতব মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। তথাপি বিভিন্ন সময়ে ধাতব মুদ্রা প্রচলিত ছিল। অর্থ উদ্ভবের পরবর্তী পর্যায় হলো টাকশালে মুদ্রার উদ্ভাবন (coinage)। তদানিন্তন রাজারা যথোচিত ওজন ও গুণসম্পন্ন নিজেদের নামাঙ্কিত মুদ্রা ব্যবহার করতেন। এই হলো টাকশালে অর্থের উদ্ভাবন।

কাগজী মুদ্রা

এরই ঠিক পরবর্তী যুগে শুরু হয় কাগজী মুদ্রা। ধাতব মুদ্রা হারিয়ে যাওয়ার বা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকায় এবং এগুলোর স্থানান্তরকরণে অসুবিধা থাকায় ইউরোপের বণিক সম্প্রদায়ের লোকেরা ও সাধারণ লোকেরা স্বর্ণকারের কাছে ঐ সব মূল্যবান ধাতু গচ্ছিত রাখত। বিনিময়ে স্বর্ণকার ঐ ব্যক্তিকে একটি 'রসিদ' দিত যাতে আমানতকারীর স্বর্ণ, রৌপ্যের জমার পরিমাণ লেখা থাকত। আমানতকারী প্রয়োজনে ঐ রসিদ দেখিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বাড়িতে এনে লেনদেনের উদ্দেশ্যে তা অন্য বিক্রেতাকে দিত। কিন্তু এভাবে অর্থ প্রদান জটিল হওয়ায় এবং কালক্রমে ঐ স্বর্ণকার 'বিশ্বাস' সৃষ্টি করতে পারায় আমানতকারীরা ঐ রসিদ দেখিয়েই লেনদেন বা বিনিময় কাজ সেরে ফেলত। এভাবে মূল্যবান ধাতুর পরিবর্তে একটুকরো কাগজ সমাজে লেনদেনের কাজ সুসম্পন্ন করত। এভাবে উদ্ভব হলো কাগজী মুদ্রার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে। বর্তমানে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ন্যস্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে। বর্তমানে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ন্যস্ত।

ঋণভিত্তিক অর্থ

বর্তমান বিশ্বে নগদ লেনদেনের তুলনায় ঋণভিত্তিক লেনদেন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ঋণভিত্তিক অর্থ বা ব্যাংক অর্থ (যেমন- চেক, ড্রাফট ইত্যাদি) লেনদেন কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঋণ ব্যতীত বর্তমান অর্থনীতি কল্পনা করা যায় না। দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশের সঙ্গে যে লেনদেন হয় তা অধিকাংশই ঋনভিত্তিক লেনদেন। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যতই বিস্তৃত হতে থাকে, অর্থের প্রয়োজনীয়তা ততই তীব্র হয়। আর ঋণভিত্তিক অর্থ (credit money) বা ব্যাংক দ্বারা সৃষ্ট অর্থ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে লেনদেন হয়ে গেছে অনেক সহজ ও সুবিধাজনক। লেনদেনের উদ্দেশ্যে লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে চেক বা ব্যাংক ড্রাফট বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়। সুতরাং ঋণভিত্তিক অর্থ বা ঋণপত্র কাগজী মুদ্রার তুলনায় অনেক বেশি উৎকৃষ্ট বা উপযোগী।

ঋণভিত্তিক অর্থ বা ঋণপত্র কাগজী মুদ্রার তুলনায় অনেক বেশি উৎকৃষ্ট বা উপযোগী।

সারসংক্ষেপ

অর্থের চারটি সনাতনী কার্যাবলী আছে। এগুলো হচ্ছে : বিনিময়ের মাধ্যম, হিসাবের একক, মূল্যের পরিমাপক ও বকেয়া পরিশোধের ভিত্তি। যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যবলীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো অর্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. আধুনিক যুগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের পাশাপাশি বন্ড, স্টক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সত্য/মিথ্যা

২. অর্থের উদ্ভাবনের আগেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আকার নিয়েছে। সত্য/মিথ্যা

৩. ঋণভিত্তিক অর্থ বা ঋণপত্র কাগজী মুদ্রার তুলনায় অধিকতর উৎকৃষ্ট। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কিভাবে কাজ করে?

২. ঋণভিত্তিক অর্থ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থের গুরুত্বসহ এর কার্যাবলী আলোচনা করুন।

২. অর্থের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য

পাঠ ৩

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ভাষ্য
- অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা

অর্থের একটি এককের (যেমন, টাকা, পাউন্ড) বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী পাওয়া যায়, তাকে অর্থের মূল্য বলে। এক কথায়, অর্থের মূল্য বলতে অর্থের সাধারণ ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। এক একক অর্থের বিনিময়ে যদি বেশি পরিমাণে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী কেনা যায় তাহলে বুঝতে হবে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বেশি। সুতরাং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বা অর্থের মূল্য দামস্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দেশে দামস্তর বেশি হলে কম পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়। অপরদিকে, কম দামস্তরে বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়। অতএব, দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরই অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয় এবং দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত। এই অর্থে অর্থের মূল্যের ধারণা একটি 'আপেক্ষিক' ধারণা মাত্র। অর্থের মূল্য ও দামস্তরের বিপরীতমুখী সম্পর্ক নিম্ন লিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরই অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয় এবং দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত।

$P=\frac{1}{VM}$ এবং $VM=\frac{1}{P}$

যেখানে P=দামস্তর এবং VM= অর্থের মূল্য

দামস্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। দামস্তর বেড়ে গেলে অর্থের মূল্য কমে। অর্থাৎ, এক একক অর্থের বিনিময়ে কম পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়। আবার, দামস্তর কমে গেলে অর্থের মূল্য বাড়ে। অর্থাৎ, এক একক অর্থের বিনিময়ে বর্তমানে বেশি পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়। অতএব, অর্থের মূল্যের পরিবর্তন জনসাধারণের অর্থনীতিতে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। অর্থের মূল্যের কেন পরিবর্তন দেখা দেয় বা কোন্ বিষয়ের দ্বারা অর্থের মূল্য নির্ধারিত হয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে।

কিভাবে সাধারণ দামস্তর নির্ধারিত হয় বা সাধারণ দামস্তরে ওঠানামা কেন হয় তার ব্যাখ্যা ক্লাসিক্যাল অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে মেলে। এ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে আলফ্রেড মার্শাল [১৯২০-র দশক অবধি] পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ সামগ্রিক ব্যয় বা সামগ্রিক চাহিদা ও দামস্তরের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে অর্থকেই মুখ্য ভূমিকা দেন। এঁদের মতে-

অর্থের যোগানের বা পরিমাণের ওপর অর্থের মূল্য বিপরীতভাবে নির্ভরশীল।

অর্থের যোগানের বা পরিমাণের উপর অর্থের মূল্য বিপরীতভাবে নির্ভরশীল। অথবা, দামস্তর ও অর্থের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। দেশে অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দামস্তরও দ্বিগুণ হবে। আবার অর্থের পরিমাণ কমে অর্ধেক হলে মূল্যস্তরও কমে অর্ধেক হবে। এটিই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূলকথা। এই তত্ত্বটি ১৫৮৬ সালে সর্বপ্রথম প্রচারিত হলেও ১৯১১ সালের মার্কিন অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের হাতে পূর্ণতা লাভ করে। কিছুকাল পরে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেন। অবশ্য মূল বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

অনুমিত শর্তাবলী

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব দুটি শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, দেশে চাহিদা ও যোগানের সামগ্রিক

ভারসাম্য থেকে 'সে'-এর বিধির [Say's law : "Supply creates its own demand"- "যোগান নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করে"] জন্য। দ্বিতীয়ত, দেশে পূর্ণ নিয়োগ থাকে। তাই উৎপাদনের কোনো উপকরণ অব্যবহৃত বা অলস হয়ে পড়ে থাকে না।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ভাষ্য

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সমর্থকদের মতে অন্যান্য দ্রব্যের মতো অর্থের মূল্য তার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। অর্থের মূল্য নির্ধারণে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ভাষ্য হচ্ছে : নগদ লেনদেন (cashtransaction version) বা ফিশারের ভাষ্য। অর্থের চাহিদা ও যোগানের উপর অর্থের মূল নির্ভর করে। অর্থের চাহিদার কথা বলতে গিয়ে ফিশার অর্থের প্রাথমিক কাজের বিনিময়ের মাধ্যমের উপরই জোর দেন। অর্থের চাহিদার সৃষ্টি হয় অর্থের সাথে বিনিময়যোগ্য দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর পরিমাণ থেকে। দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা দেখা দেয়। দেশে নগদ অর্থের মোট চাহিদা হলো বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী (T) এবং তাদের দামের গুণফল (P)। অর্থাৎ, অর্থের মোট চাহিদা $=P\times T$। অর্থের যোগান বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে দেশে মোট অর্থের পরিমাণকে বোঝায়। কিন্তু, অর্থের যোগান এর প্রচলন বেগের (velocity of circulation) উপরও নির্ভরশীল। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক একক অর্থ কতবার হস্তান্তরিত হয় তাকে অর্থের প্রচলন বেগ বলে। একটি ১০ টাকার নোট যদি পাঁচবার হাতবদল [এটিই অর্থের প্রচলন বেগ] করে তাহলে ঐ নোটটি ৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারে। অর্থের পরিমাণকে (M) তার প্রচলন বেগ (V) গিয়ে গুণ করলে দেশে মোট অর্থের যোগান কত তা জানা যায়। অর্থাৎ, অর্থের মোট যোগান= $M\times V$

দেশে নগদ অর্থের মোট চাহিদা হলো বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী (T) এবং তাদের দামের গুণফল (P)।

অর্থের যোগান বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে দেশে মোট অর্থের পরিমাণকে বোঝায়।

এই তত্ত্বে বলা হয় যে অর্থ ব্যবস্থায় মোট আর্থিক ব্যয় সবসময় বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যের সঙ্গে অভিন্নভাবে সমান (identically equal) হয়। অর্থাৎ,

$MV=\Sigma p_i q_i=PT$..... (১)

আমরা আগেই M, V, P এবং T বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করেছি। ১ নং সমীকরণের Σ(সিগমা চিহ্ন) হলো সমষ্টি নির্ণয়ের চিহ্ন, p_i হলো প্রতিটি স্বতন্ত্র দ্রব্যের দামস্তর এবং q_i হলো প্রতিটি স্বতন্ত্র বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ। ফিশার মনে করতেন যে স্বল্পকালে প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের [যথা, অর্থাদি বা বেতন প্রদানের সময় (payment period)] জন্য অর্থের প্রচলন বেগ অপরিবর্তিত থাকে। আবার, অর্থব্যবস্থায় যেহেতু সব সময়েই পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা বিরাজ করে সেহেতু T-ও স্থির থাকে। V এবং T-এর স্থিরতা বোঝানোর জন্য ২ নং সমীকরণে V এবং T মাথায় বার চিহ্ন বসানো হয়েছে। অর্থাৎ ১ নং সমীকরণটিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

$M\bar{V} =P\bar{T}$ ..... (২)

অথবা, P=**Error!**M ..... (৩)

অর্থের যোগানের উপর দামস্তরের নির্ভরশীলতা ৩ নং সমীকরণটিতে দেখানো হয়েছে।

অর্থের যোগান সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলে দামস্তর নির্ধারণের তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব বলে যে দামস্তর অর্থের যোগানের সমানুপাতিক হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা হয় যে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে অর্থ নিরপেক্ষ (neutral)। এর অর্থ হলো যে অর্থের যোগানের পরিবর্তন শুধুমাত্র আর্থিক দামস্তরেরই (absolute price level) পরিবর্তন আনে। অর্থের যোগানের পরিবর্তন প্রকৃত (relative) দামস্তরের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। অর্থের পরিমাণ বাড়লে মোট আয়, নিয়োগ স্তর, সুদের হার ইত্যাদি বাস্তব বা প্রকৃত বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকে।

অর্থের পরিমাণ বাড়লে মোট আয়, নিয়োগ স্তর, সুদের হার ইত্যাদি বাস্তব বা প্রকৃত বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকে।

১ এবং ২ নং সমীকরণে M বলতে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচলিত কাগজী ও ধাতব মুদ্রাকেই (বা নগদ টাকাকড়ি) বোঝানো হয়েছে। আধুনিক ঋণভিত্তিক সমাজে নগদ অর্থ ছাড়াও ব্যাংক আমানত বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এখন ব্যাংক আমানতকে M' এবং এর প্রচলন বেগকে V' দ্বারা চিহ্নিত করলে ২ নং সমীকরণের নিম্নলিখিত রূপ পাওয়া যায়-

$MV+M'V'=PT$ ..... (৪)

অথবা, $P=\frac{MV+M'V}{T}$

ফিশার মনে করেন যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অর্থাৎ যদি V, V′,T এবং M ও M′ এর অনুপাত স্থির থাকে, তাহলে M ও M′ যে হারে বাড়বে আর্থিক দামস্তরও সেই হারে বাড়বে।

সমালোচনা

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, এই তত্ত্ব একমাত্র পূর্ণ নিয়োগের স্তরেই কার্যকরী হয়। দেশে পূর্ণ নিয়োগ থাকলে এবং V, V′,T এবং M ও M′-এর অনুপাতে কোনো পরিবর্তন না হলেও শুধু M ও M′ এর পরিবর্তনে P-এর পরিবর্তন হয়। আমরা জানি যে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় T অপরিবর্তিত থাকে। এই অবস্থাতে M (অথবা, M ও M′) বাড়ানো হলেও Tবাড়ে না। অতএব M বাড়লে P অবশ্যই বাড়বে এবং তা M-এর সমানুপাতিক হারে বাড়বে। কিন্তু কেইন্‌স বলেন যে অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক অবস্থা হলো অপূর্ণ নিয়োগের অবস্থা। অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি কর্মনিয়োগ বাড়িয়ে দ্রব্যসামগ্রির উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ, দেশ যখন পূর্ণ নিয়োগের স্তরের নিচে থাকে তখন M বাড়লে T বাড়ে, কিন্তু P বাড়ে না। তাই বলা হয় যে অপূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্য অকেজো হয়ে পড়ে। আবার, অপূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় M যে হারে বাড়ে সে হারে যদি T বাড়ে তাহলে P স্থির থাকবে। M-এর হারের বৃদ্ধির তুলনায় যদি T-এর বৃদ্ধির হার বেশি হয় তাহলে P-এর বৃদ্ধির হার কম হবে। সুতরাং এক্ষেত্রেও ফিশারীয় যুক্তি (P-এর বৃদ্ধির হারM-এর বৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক হয়) সঠিক বলে প্রমানিত হলো না।

অপূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্য অকেজো হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, চলমান অর্থব্যবস্থায় V, V′, T ইত্যাদি স্থির থাকে না। অর্থের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রচলন বেগের পরিবর্তন হওয়াটাই স্বাভাবিক। আগেই বলা হয়েছে যে অপূর্ণ নিয়োগের জন্য অর্থব্যবস্থায় T কখনো স্থির থাকে না। এমতাবস্থায়, অর্থের পরিমাণের কোনো পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও V, V′ অথবা T-এর পরিবর্তনে দামস্তরের পরিবর্তন ঘটে। এই অর্থে এই সমীকরণের প্রতিটি উপাদান একে অপরের উপর নির্ভরশীল নয় বলে মনে করা ঠিক নয়।

চলমান অর্থব্যবস্থায় V, V′, T ইত্যাদি স্থির থাকে না।

তৃতীয়ত, ফিশারীয় বিনিময় সমীকরণটি একটি অভেদ (identity) মাত্র। এর অর্থ হলো MV ও PT সব সময় সমান। MV ও PT সব সময় সমান হলে এই সমতার সাহায্যে দামস্তর নির্ধারণ করা যায় না।

চতুর্থত, ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে দামস্তর ও অর্থের পরিমাণের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তা হলো প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক। সমালোচনা করে বলা হয় যে এদের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষও নয়। ফিশার অর্থের যোগানের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋন অর্থকে বিবেচনা করলেও ঋনরূপী অর্থের সঙ্গে যে সুদের হারের সম্পর্ক আছে তা তিনি আলোচনা করেননি। আবার, অর্থের পরিমাণের পরিবর্তন প্রথমেই সুদের হারকে দামস্তরকে নয় প্রভাবিত করে এবং মোট উৎপাদন ও দামস্তর সুদের হারের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দামস্তরের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি হলো নিম্নরুপ-

অর্থের পরিমাণের পরিবর্তন→সুদের হারের পরিবর্তন→বিনিয়োগের পরিবর্তন→উৎপাদন, নিয়োগ ও আয়স্তরের পরিবর্তন→দামস্তরের পরিবর্তন।

পঞ্চমত, কেইন্‌সের মতে দামস্তর আয়স্তরের দ্বারা নির্ধারিত হয়- অর্থের পরিমাণ দ্বারা নয়। তাঁর মতে আয়স্তর বৃদ্ধির অর্থই হলো কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি। পূর্ণ নিয়োগের স্তরে পৌঁছানোর পর অর্থ ব্যবস্থায় কার্যকরী চাহিদা বেড়ে গেলে দামস্তরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দামস্তর নির্ধারণে অর্থের যোগানকে একমাত্র

শক্তি বলে মনে করা ভুল। দামস্তর নির্ধারণে আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি উপাদানগুলোর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়।

পরিশেষে, বাস্তবে অর্থের পরিমাণের বৃদ্ধি ছাড়াই দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, যুদ্ধ, উৎপাদনী ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদি। এই তত্ত্ব অর্থের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের দোষে দুষ্ট।

তথাপি এই তত্ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (যেমন, ১৯২৩-২৪ সালে জার্মানিতে ১৯৪৭-৪৮ সালে চীনে) যখনই অর্থের যোগান অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই মুদ্রাস্ফীতির ছায়া দেখা গেছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিল্টন ফ্রিডম্যান অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্যের সমর্থক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মপন্থা (policy) নির্ধারণে তত্ত্বটির গুরুত্ব কম নয়। মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের যোগানের পরিমাণ হ্রাস ও বৃদ্ধি করে। সুতরাং অর্থের পরিমাণতত্ত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতির (monetary policy) উপর গুরুত্ব দেয়।

সারসংক্ষেপ

দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরই অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত। অর্থের মূল্য নির্ধারণে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ভাষ্য হচ্ছে- নগদ লেনদেন বা ফিশারের ভাষ্য। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থ ব্যবস্থায় মোট আর্থিক ব্যয় সব সময় বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যের সঙ্গে অভিন্নভাবে সমান হয়। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা করা হয়েছে। তথাপি এই তত্ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
(সঠিক উত্তরটির চিহ্নিত করুন)

১. দামস্তর কমে গেলে অর্থের মূল্য কমে। সত্য/মিথ্যা
২. ফিশারের মতে লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা দেখা দেয়। সত্য/মিথ্যা
৩. ফিশারের তত্ত্ব অনুযায়ী দামস্তর অর্থের যোগানের সমানুপাতিক হয়। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১. অর্থের প্রচলন বেগ (velocity) কি?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. সমালোচনাসহ অর্থের পরিমাণতত্ত্ব আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর
১. মিথ্যা ২. সত্য ৩. সত্য

পাঠ-৪

অর্থের চাহিদা তত্ত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- অর্থের চাহিদা কি
- লেনদেনের উদ্দেশ্যে চাহিদা
- সাবধানতার উদ্দেশ্যে চাহিদা
- ভবিষ্যৎ ভেবে চাহিদা

লোকে কেন নগদ অর্থ ধরে রাখতে চায়? যেহেতু সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে অর্থ সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি (liquid asset), সেহেতু লোকে অর্থ বেশি পছন্দ করে। তাদের সম্পদ লগ্নীপত্রের আকারে রাখার পরিবর্তে নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখতে চায়। একে নগদ পছন্দ বা তারল্য পছন্দ (liquidity preference) বলে।

অর্থের চাহিদার মূল তিন কারণ এবং চাহিদার দরুন আয়সীমা ও সুদের হারের পরিবর্তন এই অংশের প্রতিপাদ্য। অর্থের চাহিদা বলতে বোঝায় প্রকৃত ভারসাম্য তৈরির চাহিদাকে। অন্যভাবে বললে মানুষ অর্থ ধরে রাখে অর্থ ক্রয় ক্ষমতার জন্য। যে পরিমাণ পণ্য কিনতে পারে সে জন্য। বিবৃত অর্থ ধারণ নিয়ে মানুষ চিন্তিত নয়। এই থেকে-

ক. প্রকৃত অর্থের চাহিদা মূল্যসীমার সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। অন্যান্য প্রকৃত উপাদান যথা সুদের হার, প্রকৃত সম্পদ ইত্যাদির চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে।

খ. বিবৃত টাকা বা অর্থের চাহিদা মূল্যসীমার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। (যখন প্রকৃত উপাদানগুলো নির্দিষ্ট)।

অর্থের ধাঁধা থেকে কোনো মানুষ তখনই মুক্ত যখন মূল্যসীমার বৃদ্ধিতে অন্যান্য প্রকৃত উপাদান স্থির থাকে এবং মানুষের প্রকৃত অর্থের চাহিদাও থাকে অপরিবর্তিত।

এই আচরণ দুটোর একটি বিশেষ নাম আছে। অর্থের দ্বন্দ্ব বা অর্থের ধাঁধা। অর্থের ধাঁধা থেকে কোনো মানুষ তখনই মুক্ত যখন মূল্যসীমার বৃদ্ধিতে অন্যান্য প্রকৃত উপাদান স্থির থাকে এবং মানুষের প্রকৃত অর্থের চাহিদাও থাকে অপরিবর্তিত। অন্যদিকে যে মানুষের প্রকৃত অর্থের চাহিদা মূল্যসীমার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় (যখন অন্যান্য প্রকৃত উপাদান স্থির) তখন মানুষটি অর্থের ধাঁধায় পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো জনগণ কেন বা কি কি উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা করে থাকে? কেইন্‌সের আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'সাধারণ তত্ত্ব' (General theory) বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগে থেকেই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাহায্যে অর্থের চাহিদার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হতো।

ফিশারীয় তত্ত্বে লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদার উদ্ভব হয়। লেনদেনের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা নির্ভর করে আয়স্তরের ওপর।

আরভিং ফিশার অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই লোকে নগদ অর্থের চাহিদা করে থাকে। যেহেতু অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় একই সঙ্গে ঘটে না সেহেতু লোকে অর্থের চাহিদা করে থাকে। মোট কথা, ফিশারীয় তত্ত্বে লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদার উদ্ভব হয়। লেনদেনের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা নির্ভর করে আয়স্তরের উপর। উচ্চ আয়ের স্তরে লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা বেশি হবে, নিম্ন আয়ের স্তরে এর বিপরীত হবে। ১৯৩০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেওয়ায় কেইন্‌স ক্লাসিক্যাল ধ্যান ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করলেন। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত The

General Theory of Employment, Interest and Money বইতে তিনি চাহিদার বিশেষ ব্যাখ্যা দেন যা ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা থেকে স্বতন্ত্র।

লর্ড কেইন্‌সের জনপ্রিয় তিনটি অর্থ ধরে রাখার কারণ হলো :
১. লেনদেন উদ্দেশ্য : দাম পরিশোধের জন্য টাকার যে সাধারণ প্রয়োজন।
২. সাবধানতা অবলম্বনে : হঠাৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য।
৩. দূরকল্পনার কারণে বা ভবিষ্যৎ ভেবে : ধারণকৃত সম্পদের অর্থ মূল্যের তারতম্যের কারণে।

লেনদেন এবং সাবধানতার উদ্দেশ্যগুলোতে M_1 জড়িত। দূরকল্পনার পুরোটাতেই M_2 ও M_3 জড়িত।

কেইন্‌সের বিবৃত কারণগুলো অনুসারে অর্থ ধারণা আলাদা করা সম্ভব নয়। অন্তত কারণ অনুসারে ঠিক তিনটি ভাগে প্রকৃত অর্থকে আলাদা করা অসম্ভব। ধরুন, আপনার কাছে ৫০০ টাকা আছে। তাহলে কি এটা ধরে নেয়া ঠিক হবে যে, তিনটি কারণে আপনি টাকা ধারণ করছেন তা ভাগ করলে ২০০, ২০০ ও ১০০ টাকা করে জমা পড়বে? একটি কারণে টাকা ধারণ করলেও অন্য উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে তখন টাকা ব্যয় করা সহজাত প্রবৃত্তি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে জমানো টাকা কি আমরা বর্তমানের প্রয়োজন মেটাতে খরচ করি না? অবশ্যই করি। এজন্যই তিনটি কারণের বা উদ্দেশ্যের সম্মিলিত চাহিদাই মানুষের অর্থের প্রকৃত চাহিদা। 'অর্থের চাহিদা তত্ত্ব' অবশ্য গড়ে উঠেছে অর্থ ধরে রাখার লাভ এবং ধরে রাখার সুদের হারের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে। অর্থ (M_1 মুদ্রা ও চলতি হিসাব) সাধারণত কোনো সুদ আয় করে না বা অন্যান্য সম্পদের তুলনায় সুদের হার কম। অর্থ ধারণের কারণে মানুষ সুদের হার যতো বেশি হারাবে সে ততো কম অর্থ হাতে রাখবে। অন্যভাবে বললে অর্থ হাতে রাখার মূল্য হলো অর্থের উপর সুদের হার এবং অন্যান্য সমতুল্য সম্পদের উপর সুদের হারের (সঞ্চয় হিসাব, কমার্শিয়াল পেপার) ব্যবধানের উপর। অর্থের উপর সুদের হারকে বলা হয় স্বীয় হার এবং ধারণের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost) সমতুল্য সম্পত্তি এবং স্বীয় হারের পার্থক্য।

লেনদেনের চাহিদা

দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য যে নগদ টাকার প্রয়োজন সেটাই লেনদেনের চাহিদা। খবরের কাগজ, খাওয়া দাওয়া, ভাড়া ইত্যাদি ব্যয়গুলো লেনদেনের চাহিদার মধ্যে পড়ে।

খবরের কাগজ, খাওয়া দাওয়া, ভাড়া ইত্যাদি ব্যয়গুলো লেনদেনের চাহিদার মধ্যে পড়ে।

চাহিদা মেটানোর জন্য কতটুকু একজন ব্যয় করবে তা নির্ভর করে অর্থ ধরে রাখার জন্য যে সুদের পরিমাণ হারাচ্ছে এবং যে ব্যয় হচ্ছে তার উপর। ধরুন কোনো ব্যক্তি মাসে ১৮০০ টাকা আয় করে এবং পুরো মাস জুড়ে সমান হারে এই টাকা সে খরচ করে। খরচের হার দিন প্রতি ৬০ টাকা। তাহলে ঐ ব্যক্তি ইচ্ছে করলে ১৮০০ টাকা কোনো চলতি হিসাব বা অন্য কোনো খাতে জমা রেখে প্রতিদিন ৬০ টাকা করে তুলে খরচ করতে পারে। আবার ১৮০০ টাকা জমা রখার পর পুরোটা তুলে তা থেকে প্রতিদিন খরচ করতে পারে। সে ইচ্ছে করলে পুরো টাকাটা থেকে ৬০ টাকা খরচের উপর বাকি ১৭৪০ টাকা দৈনিক সুদের সঞ্চয় হিসেবে রাখতে পারে। তাহলে প্রতিদিন সে ৬০ টাকা করে ঐ ব্যাংক থেকে তুলে নেবে। তাহলে মাস শেষে সে বেশ কিছু টাকা সুদ থেকে লাভ করবে। প্রতিদিনের শুরুতে সর্বনিম্ন ৬০ টাকা হাতে রেখে বাকী অংশটি ব্যাংকে সঞ্চয় হিসেবে রাখায় সে এই লাভের অংশটি অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে কম পরিমাণ টাকা হাতে রাখার খরচ হলো ব্যাংকে আসা যাওয়ার ঝামেলা ও যাতায়াত খরচের যোগফল।

চিত্র ৯.১ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির বিবৃত মাসিক আয় Y_N. যদি সঞ্চয় হিসেবে রাখা হয় তাহলেi সুদের হার লাভ হয়। যেখানে হাতে টাকা থাকলে সুদ হিসেবে এক টাকাও পাওয়া যেত না। হাতের টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখার খরচ tc, এই tc ব্যয়ের মধ্যে ব্যক্তিটির ব্যবহৃত সময়ের হিসাব অন্তর্ভুক্ত। কিংবা অন্যকে দায়িত্ব দেয়া হলে সেটাও গণ্য করা হবে। সহজভাবে এই খরচটিকে বা ব্যয়কে ব্রোকার ফি বলা হয়। চিত্র ৯.১ অনুযায়ী টাকা লেনদেনের জন্য প্রতিবার খরচ হচ্ছে tc পরিমাণ মুদ্রা। চিত্র ৯.১ অনুযায়ী প্রতি লেনদেনের জন্য খরচ MC এবং লাভ হচ্ছে MB। টাকা ওঠানোর সংখ্যা যতো বাড়ছে লেনদেনের গড় খরচ ততো বাড়ছে। অর্থাৎ টাকা জমা রাখার জন্য প্রাপ্ত সুবিধা ততো কমছে। চিত্র অনুযায়ী মোট লেনদেন সংখ্যা n। যেখানে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ ও লেনদেনের ব্যয় সমান। মোট লেনদেন সংখ্যা, আয়সীমা দেয়া থাকলে গাণিতিকভাবে ব্যক্তির টাকা ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করা সম্ভব। উইলিয়াম বওমল এবং জেমস্ টবিনের মতে-

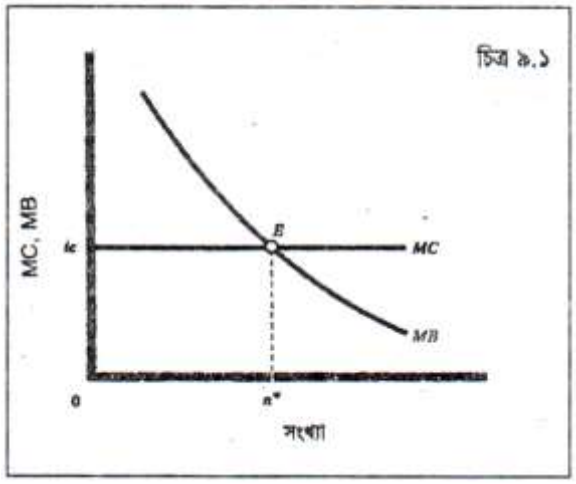

$$M^* = \sqrt{\frac{t_C \times Y_N}{2i}} \quad \text{.....(১)}$$

সমীকরণ (১) থেকে বোঝা যায় অর্থ লেনদেনের পরিমাণ ব্রোকারেজ ফি এবং আয়সীমার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়।

টাকার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

সমীকরণ (১) থেকেই আমরা দেখতে পাই অর্থের চাহিদা আয়সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে, $\frac{M}{Y_N}$ আয় বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে মানুষ হাতে কম টাকা রাখে। অন্যভাবে বললে অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর চেয়ে কম[(১) নং সমীকরণে তা $^১/_২$]। আয়ের স্থিতিস্থাপকতা ১% আয় সীমার পরিবর্তনে অর্থের চাহিদার পরিবর্তন নির্ণয় করে। (১) নং সমীকরণ অনুযায়ী ব্রোকারেজ ফি-এর সাপেক্ষে অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হলো $^১/_২$, সুদের হারের সাপেক্ষে -$^১/_২$।

মূল্যসীমার সমানুপাতিক পরিবর্তনে প্রকৃত ভারসাম্যের চাহিদায় কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

এ থেকে বোঝা যায়, আয় যতো বাড়বে অর্থ লেনদেনের খরচ ততো কমবে। কারণ অর্থ লেনদেনের অঙ্ক বা পরিমাণ যতো বড় হবে লেনদেনের গড় খরচ ততো কমবে। কখনও কখনও ১০ মিলিয়ন ডলারের লেনদেনের খরচ ১০ ডলার হতে পারে। ব্যক্তিগত খরচের তুলনায় পারিবারিক বা সমষ্টিক খরচ সব সময়ই বেশি। তবে এক্ষেত্রে ব্রোকারেজ ফি (tc) বেশি হয়। কারণ সময়ের মূল্যকে অনেক উচ্চে ধরা হয়। সুতরাং আয় (Y_N) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খরচ (tc)ও বাড়তে থাকে। যেহেতু মানুষের টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখবে তাই আয় যতো বাড়বে সে ততো বেশি ব্যাংকে যাবে। ফলে লেনদেন খরচ ততো বাড়বে। সুতরাং স্থিতিস্থাপকতা ১/২-এর চেয়ে বৃদ্ধি পাবে।

প্রকৃত ভারসাম্যের চাহিদা

প্রকৃত ভারসাম্যের চাহিদা এবং অর্থের চাহিদা একই। মূল্যসীমার সমানুপাতিক পরিবর্তনে প্রকৃত ভারসাম্যের চাহিদায় কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যখন সবকিছুর মূল্য সীমা দ্বিগুণ হয় তখন-

$$M=\sqrt{\frac{tc \times Y_N}{2i}} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (২)$$

উপর্যুক্ত সমীকরণে Y_N ও tc এর মানও দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ বিবৃত আয় এবং বিবৃত ব্রোকারেজ ফি দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং (২) নং সমীকরণ অনুযায়ী প্রকৃত আয়ের সাপেক্ষে প্রকৃত ভারসাম্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১/২। শুধু মূল্যসীমার বৃদ্ধির কারণে যদি আয়সীমার (tcসহ) পরিবর্তন হয় তাহলেই বিবৃত ভারসাম্যের চাহিদার আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটবে।

যোগ্যতা

বিবৃত বওমল-টবিন সমীকরণটিতে প্রকৃত আয় এবং সুদের হারের সাপেক্ষে অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যথাক্রমে ১/২এবং -১/২। তবে যেহেতু কোনো ব্যক্তি লেনদেন করে পূর্ণ সংখ্যায়, ভগ্নাংশে নয়। অর্থাৎ লেনদেন সংখ্যা **১, ২, ৩** হতে পারে **১.২৫** বা **৩.৫৭** নয়। মানুষ বড়জোর একবার কিংবা দু'বার টাকা-বন্ডের লেনদেন করে। এ থেকে দেখানো যায়, অর্থের চাহিদার ও আয়ের স্থিতিস্থাপকতা ১/২থেকে **১** এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর সুদের স্থিতিস্থাপকতা থাকে -১/২থেকে ০-এর মধ্যে। এই সমীকরণের মাধ্যমে এটা দেখানো যায় অর্থের লেনদেনের সংখ্যা ও টাকা প্রাপ্তির সময়কালের মধ্যে সম্পর্ক আছে। বাস্তবে কোনো কোনো ব্যক্তি তাদের চলতি হিসাবে মাসিক বেতন পায়। ফলে বওমল-টবিনের তত্ত্ব অনুযায়ী তারা অর্থ-বন্ডের লেনদেন ঘটায় না। তারা তাদের মাসিক বেতনের অর্ধেক হাতে রাখে। অর্থ প্রাপ্তির সময় যতো দীর্ঘ হয় মানুষের হাতে অর্থ ধরে রাখার পরিমাণ ততো বাড়ে।

অর্থ প্রাপ্তির সময় যতো দীর্ঘ হয় মানুষের হাতে অর্থ ধরে রাখার পরিমাণ ততো বাড়ে।

সাবধানতা অবলম্বনে

মানুষের অর্থের চাহিদার অন্যতম আরেকটি কারণ অনিশ্চয়তা। হঠাৎ প্রয়োজন মেটাতে আমাদের অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। কিংবা হঠাৎ করেই আমরা পাওনা অর্থ পেতে পারি। এই দেনা-পাওনার অনিশ্চয়তা থেকেও অর্থের চাহিদার উদ্ভব ঘটে।

মানুষের অর্থের চাহিদার অন্যতম আরেকটি কারণ অনিশ্চয়তা। হঠাৎ প্রয়োজন মেটাতে আমাদের অর্থের প্রয়োজন হতে পারে।

মানুষ যতো বেশি অর্থ হাতে রাখে ততো বেশি তারল্য অবস্থায় সে আছে। অর্থাৎ সহসা প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা তার ততো বেশি। কিন্তু একই সঙ্গে যে যতো বেশি অর্থ হাতে রাখছে সে ততো বেশি সুদের আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঠিক কতটুকু অর্থ হাতে রাখা উচিত তা নির্ণয় করা কঠিন। তরলতার অভাবের মোট খরচ হলো-

$iM+p(M,\sigma)q$
এখানে
iM=অর্থ হাতে রাখার জন্য প্রাপ্ত সুদ থেকে বঞ্চিত হবার পরিমাণ
p(M, σ)V=নির্দিষ্ট মাসে তারল্য অভাবে পড়ার সম্ভাবনা
M= অর্থের পরিমাণ G= অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি

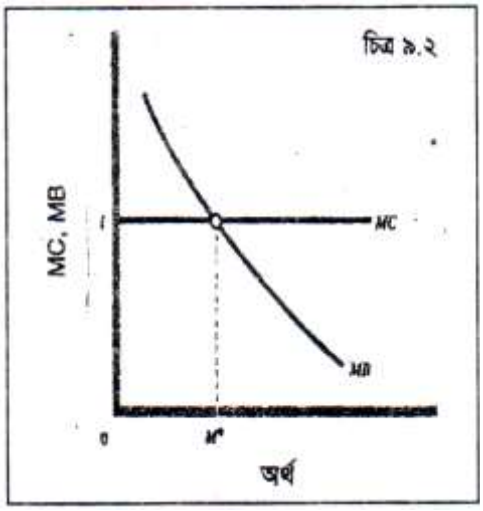

চিত্র ৯.২ অনুযায়ী প্রান্তিক ব্যয় হলো যে পরিমাণ সুদের হার টাকা হাতে রাখার জন্য ছাড় দিতে হচ্ছে তার সমান। তারল্যের অভাব দূর করার প্রত্যাশিত খরচ যতো কম প্রান্তিক লাভ ততো বেশি। চিত্র অনুযায়ী M*সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা। সুদের আয় যতো কমবে সাবধানতা অবলম্বন হেতু খরচ ততো বাড়বে। সুদের হার কমলে MC রেখাটি নিচের দিকে নামবে, ফলে M*আরও ডানদিকে সরে যাবে। তাই খরচ বাড়বে। অন্যদিকে অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি যতো বাড়বে মানুষ ততো বেশি অর্থ হাতে রাখবে। ফলে MB রেখাটি উপরের দিকে উঠবে। এমন অবস্থায় মানুষ অনির্দিষ্ট পরিমাণ খরচ মেটানোর জন্য বাড়তি অর্থ হাতে রাখবে। q বা অর্থের চাহিদা কমার সঙ্গে সঙ্গে MB রেখাও নিচের দিকে নেমে আসবে। যা পর্যায়ক্রমে অর্থ হাতে রাখার খরচ কমাবে। সাবধানতা অবলম্বনের এই তত্ত্বটি অনিশ্চয়তা মেটানোর জন্য ব্যবহৃত যে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রভাবকগুলো হলো- সুদ গ্রহণ না করার বিকল্প খরচ, তারল্য অভাবের খরচ, অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকির পরিমাণ যা তারল্যভাবের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

সুদের আয় যতো কমবে সাবধানতা অবলম্বন হেতু খরচ ততো বাড়বে।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

লেনদেন এবং সাবধানতা অবলম্বনের কারণে অর্থের যে চাহিদা, দুটোই অর্থের বিনিময় মাধ্যম কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিনিময় মাধ্যম হিসেবে অর্থের গ্রহণযোগ্যতাই চাহিদার তারতম্যের সৃষ্টি করে। তবে মূল্যের পরিমাপক হিসেবেও টাকার ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। যার প্রভাব আমরা কোনো ব্যক্তির পোর্টফোলিওতে দেখতে পাই। মানুষ বা কোনো ব্যক্তি নিজের সম্পদগুলো যেভাবে ধারণ করে তাই তার পোর্টফোলিও। অনেকে ধারণা করতে পারে যে মানুষ সর্বোচ্চ প্রাপ্তি অনুসারে পোর্টফোলিও গঠন করবে। কিন্তু, প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার কারণে কোনো একটি সম্পদ দিয়ে পোর্টফোলিও তৈরি ঝুঁকিপূর্ণ। কোনো নির্দিষ্ট শেয়ারের মূল্য বছরে দ্বিগুণ হলে সম্পদের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু দ্বিগুণ পরিমাণে কমে গেলে তখন কি হবে? এজন্যই কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তার যাবতীয় আয় কোনো নির্দিষ্ট একটি সম্পদের উপর বিনিয়োগ করে না। যতোখানি সম্ভব ঝুঁকি কমাতে সে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ ক্রয় করে।

শেয়ার বা বন্ডের মতো অনিশ্চয়তাপূর্ণ সম্পদের চেয়ে মানুষ অর্থকে সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী।

শেয়ার বা বন্ডের মতো অনিশ্চয়তাপূর্ণ সম্পদের চেয়ে মানুষ অর্থকে সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী। কারণ অর্থের বিবৃত বা বর্তমান বাজারমূল্য নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা কম। মানুষ তাই অর্থ ধরে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। টবিন তার 'লিকিউডিটি প্রেফারেন্স অ্যাজ বিহেভিয়ার টুয়ার্ড রিস্ক' লেখায় এই ব্যাপারটির ব্যাখা দিয়েছেন। তার মতে, অর্থের চাহিদা নির্ভর করে প্রত্যাশিত ইল্ড (আয়) এবং অর্থ সাপেক্ষে অন্যান্য সম্পদের ঝুঁকির পরিমাণের উপর। এই ঝুঁকির পরিমাণ সম্পদগুলোর আয়ের তারতম্য দিয়ে পরিমাপ করা হয়। টবিন দেখিয়েছেন, অন্যান্য সম্পদের আয়ের পরিমাপ বৃদ্ধিকে অর্থ ধরে রাখার

খরচ বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়। অন্যভাবে, অন্যান্য সম্পদের আয়ের ঝুঁকি বাড়লে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে। এই ঝুঁকি কমানোর জন্যই বিনিয়োগকারীরা স্বল্প ঝুঁকি বা ঝুঁকিহীন সম্পদ খোঁজ করে। অন্যান্য শেয়ারের মতো সঞ্চয় হিসাব বা চলতি হিসাবেও সমান ঝুঁকি আছে। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোতে প্রাপ্তির মাত্রা বেশি।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ভেবে অর্থের চাহিদার তারতম্যের অবস্থার কারণের সঙ্গে লেনদেন ও সাবধানতার উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। সুদের হারের বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘ সময়ের বন্ড ইল্ড বৃদ্ধি পাবে। ফলে অর্থের M_2 অংশের চাহিদা কমে যাবে। সঞ্চয় হিসাবের বিনিয়োগ প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি পাবে। ফলে লোকেরা অর্থ (M_1)-এর বদলে সঞ্চয় হিসাবে বিনিয়োগ করে পোর্টফোলিওর প্রাপ্তির বৃদ্ধি ঘটাবে। তবে কোনো কোনো বিনিয়োগকারী (বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক ট্রাস্ট, ব্যাংক ইত্যাদি) শুধু সঞ্চয় হিসেবে নয় ঝুঁকিমুক্ত উচ্চ সুদযুক্ত সম্পদও ক্রয় করে। ট্রেজারি বিল বা সিডি (সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট) এমন সম্পদ।

সারসংক্ষেপ

লর্ড কেইন্‌সের মতে, তিনটি কারণে অর্থের চাহিদা রয়েছে। ক. লেনদেন উদ্দেশ্য, খ. সাবধানতা অবলম্বনে, গ. ভবিষ্যৎ ভেবে। এই তিনটি কারণের বা উদ্দেশ্যের সম্মিলিত চাহিদাই মানুষের অর্থের প্রকৃত চাহিদা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
(সঠিক উত্তরটির চিহ্নিত করুন)

১. অর্থ অধিকতর তরল সম্পত্তি (liquid asset)। সত্য/মিথ্যা
২. লেনদেনের উদ্দেশ্যে M_2 জড়িত। সত্য/মিথ্যা
৩. অর্থ প্রাপ্তির সময় যতো দীর্ঘ হয় অর্থ ধরে রাখার পরিমাণ ততো কমে। সত্য/মিথ্যা
৪. সুদের হারের বৃদ্ধির জন্য M_2অংশের চাহিদা বেড়ে যাবে। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১. লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা কি?
২. সাবধানতা অবলম্বনে কিভাবে অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়?
১. ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কি অর্থের চাহিদা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. অর্থের চাহিদা তত্ত্ব আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর
১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. মিথ্যা ৪. মিথ্যা